পথিক

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

বহুদিন ঘন বর্ষার পর আজ পুঞ্জীভূত মেঘের অন্তরাল দিয়ে সূর্যরশ্মির ঝিলিক দেখা দিয়েছে। অনেকটা দিন গৃহবন্দী থাকার পর মনটা আজ বর্হিপানের দিকে ছুটে যেতে চাচ্ছে বলে অপরাহ্নকালে ঘর ছেড়ে পথে বের হলাম। ভাবছি কোথায় যাওয়া যায় ? শেষকালে নিশ্চুপ মন কথা বলে উঠল – আর কোথায় চল সী বীচে যায়।

ভাবলাম মন্দ হয় না । মানুষের সুখ–দুঃখের সাথে বিশাল ঐ সাগরের যোগাযোগ রয়েছে বলেই মানুষ কিছুটা কাল তার তীরে বসে মনের আবেগটুকু প্রকাশ করে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় গৃহ অভিমুখে যাত্রা করে। এমন সময় ছিল যখন প্রায় প্রতিটি অপরাহ্নই কাটত এই সাগরতীরে। সময় বৃদ্ধ যাযাবরের মত বয়ে চলে তার ছুটন্ত তেজী ঘোড়াটার পিঠে চড়িয়ে মানুষকে কোথা হতে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয় তার কোন ইয়ত্তা নাই। বোধ করি আট–নয় বছর পর পুনরায় পুরনো সুখ–দুঃখের সাথী বন্ধুটার সাথে স্বাক্ষাত ঘটবে। শহরে আসা অবধি শ্রাবণের প্রচন্ড বারি–ধারার কারনে ঘর হতে বাইরে পা ফেলতে পারি নাই। এক অজানা অনুভুতি নিয়ে সাগর তীরে পৌঁছলাম।

যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। কোথাও যে একটু বসব তার কোন ইয়ত্তা নাই। চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম অসংখ্য প্রেমিক যুগল এসে জুটেছে যেন একটা অভয়ারন্য।ওদের ভীড়ের মাঝে নিজেকে প্রচন্ড অসহায় এবং নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল বিধায় ওদেরকে ডিঙিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে একেবারে একাকী একটা পাথরের ওপর বসে দুরপানে চাইলাম। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উতরিয়ে গেছে। দুরে জেলে ডিঙি নৌকাগুলো হতে অত্যান্ত ক্ষীণ জোনাকীর মত আলো জ্বলছে। বৃহৎ জাহাজগুলি হতে যে আলোর ঝলকানি উঠছে তা সাগরের নোনা জলের ওপর বিচ্ছুরিত ভাবে পড়ে চোখ–ধাঁধানো আলোকময় মরিচীকা সৃষ্টি করেছে। দুর দীগন্তে আকাশ মাঝে যে তারা গুলি জ্বলছে মনে হচ্ছে সেগুলি সাগরের বক্ষমাঝে খেলা করছে। যেন আকাশ আর সাগরের গভীর মিতালী। একে ওপরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে চায়। কালো ঘনায়িত অন্ধকারের পানে চেয়ে নিজের ভবিষ্যত অন্ধকারের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করছি আর কল্পনার অতল সাগরে প্রবেশ করেছি।আকষ্মাৎ চারপার্শ্বে জন পাঁচেকের ছায়ামূর্তি দেখে মনের কুয়াশা একেবারে কেটে গেল।

ছায়ামূর্তি গুলো একেবারে সম্মুখে এসে ঘিরে ফেলল। ওদের দু'জন দুইহাত ধরে ফেলল আর একজন পকেট হতে মানিব্যাগ বেরকরে নিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ঠ হয়ে ধক্‌ধক্ করে কাঁপতে লাগলাম। মানিব্যগে বেশ কিছু টাকা ছিল। একজন সমস্ত টাকাগুলি বের করে অন্য সবাইকে উদ্দেশ্য বলল –

: আজকের আড্ডাটা ভালই জমবে। একথা শুনে আমি আর সইতে পারলাম না। সমস্ত ভয় ডর দুর করে শক্তি সঞ্চারিত করে বলে উঠলাম। আমার সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আড্ডা করবে? ধিক্ তোমাদের–ধিক্ তোমাদের পিতা–মাতাদের। ওদের একজন কর্কসস্বরে বলে উঠল

– : আমাদের মা তো এই দেশ আর বাবা এদেশের শাসনকর্তারা, তাদেরকে ঘৃণা করতে পারিস্ না ? দেখে তো বোঝা যাচ্ছে পেটে বিদ্য – বুদ্ধি কিছু আছে। বুঝিসনা কেন ছিনতাই করি ? মদ খাবো মদ , মনের হতাশা দুর করার এটাই উত্তম পথ বুঝলি? ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কথাগুলি বারংবার আমার কানে ঝংকার দিতে লাগল। হত বিহ্বলের ন্যায় ওদের গন্তব্যের পানে চেয়ে রইলাম। যখন ওরা সম্পূর্ন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন আমার মনে পুনরায় ভাবনার উদয় হলো। ভাবতে লাগলাম আমি ও তো পারতাম ওদের মত অপরের পকেট লুট করে নিদ্রা যেতে। কিন্তু করলাম না কেন ? তবে কি আমি কাপুরুষ ? একথা বিষ্টির মুখে বেশ কয়েকবার শুনেছি। বিষ্টির কথা মনে পড়তেই মনের মাঝের দগদগে ক্ষত বেয়ে রক্ত যেন ঠিক্‌রে পড়তে লাগল । পুরনো স্মৃতি একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বড় দরিদ্রের ঘরে জন্ম হয়েছিল আমার। দু'বেলা পেঠ পুরে খেতে পেতামনা। দু'ভাই – একবোন, বাবা – মা আর আমি মোট ছয়জনের ভরন পোষণ চালাতেন আমার বাবা – অপরের বাড়ীতে মজুরী খেটে। আমি ছিলাম সবার বড়। সংসারের অভাব – অনটন দেখে শেষে মজুরের ছেলে মজুর হলাম কিন্তু মনের মাঝে অদম্য বাসনা ছিল পড়ালেখার। আমার আগ্রহ দেখে পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ একদিন এসে বললেন – ঃ সুর্যের আর এক নাম রবি , তুই ও রবি। তোর মধ্যে জলন্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে – তুই নষ্ট করে দিস্ না বাবা। স্যারের কথা শুনে প্রতিউত্তরে মাথাটাকে নীচু করে ধীরে ধীরে বললাম– ঃ তবে আমি কি করব স্যার ? তিনি বললেন – স্কুলের সমস্ত বেতন আমি মাফ করে দিলাম। তুই রাত্রিকালে যে সময় পাবি তার স্বার্থক ব্যাবহার করবি। আমার বিশ্বাস তুই একদিন মানুষের মত মানুষ হবি। মানুষ অবশ্য একদিন হয়েছিলাম কিন্তু ঝিমানো মানুষ। সে সব থাক্ যা বলেছিলাম তাই বলি। অনধিকার চর্চা করে পাঠকের মনে বিরক্ত সঞ্চার করব না। যা বলা আবশ্যক তাই বলি।

স্যারের কথা মতো কাজ করে এস,এস,সি প্রথম বিভাগে পাশ করে গ্রামের একটি কলেজে ভর্তি হলাম এবং যথারীতি এইচ,এস, সি ও দ্বিতীয় বিভাগে বিজ্ঞান শাখা হতে পাশ করলাম। তারপর একদিন বাবা আমাকে ডেকে বললেন – বাবা রবি – নিজেকে বাঁচা। শুনেছি শহরে অনেক টিউশনি পাওয়া যায়। আমাদের কথা ভাবিস না। তুই শহরে যা, যেভাবে পারিস শহরে গিয়ে পড়ালেখা শেষ কর।

ভাবলাম প্রস্তাবটা মন্দ নয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে কাজেম আলি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক জনাব আব্দুল আজীজ এর বাসায় এসে উপস্থিত হলাম। উনার সহযোগিতায় স্থানীয় ডি,সি রোডে দু'বেলা খাবারের শর্তে একটা বাসায় টিউশনি পেলাম। আপাতত থাকবার জায়গা জুটল মাসিক দুইশত টাকা ভাড়ায় একটা গ্যারেজের পাশে। সঙ্গে করে প্রায় শ ' পাঁচেক টাকা এনেছিলাম বলেই রক্ষা নচেৎ কি যে হত! এর কিছুদিন পর আর ও একটা বাসায় টিউশনি পেলাম। অনার্স ভর্তির সময়ে মায়ের শেষ স্মৃতি চিহ্ন যে স্বর্নের চেনটা ছিল তাই বিক্রি করে চট্টগ্রাম কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হলাম। দিন ভালই চল্‌ছিল। টিউশনি কলেজ আর পড়ালেখা।এমনি করে বৎসর কাল অতিক্রান্ত হল। অনার্স প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শেষ হলো

এমনি সময়ে কিছুটা অনিচ্ছাসত্বে ও নতুন এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লাম। আমার একথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন " তোমার একাজ সাজেনা বাপু"। দরিদ্র ঘরের ছেলে শহরে এসেছে পড়ালেখা করতে । কেন তুমি এহেন সম্পর্কে জড়াবে। শেষ অবধি এর পরিনতি ভাল হয়না তা সকলেই অবগত। অবশ্য কথাটা ঠিক । কিন্তু কেন যে সেই মন্দ সম্পর্কের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম তা জানে এই মন এবং এই মনের সৃষ্টিকর্তা। তখন বুঝতে পারি নাই এখন পেরেছি বলেই এ সত্য ভাষন লিপিবদ্ধ করার জন্য হাতে কলম ধরেছি। কলম তো ধরলাম ভয় হয় পাছে পাঠক-পাঠিকা এসত্য ভাষনকে হেসে উড়িয়ে দেয়। অবশ্য দেবেনা তা ও নয়। বাস্তবতার সম্মুখীন যারা হন নাই তারা অবশ্যই উদ্ভট কল্পনা বলে আমর এ লেখনি টুকরো করে যথাস্থান অর্থাৎ ডাষ্টবিনের পাশে ফেলবেন। দিন আর নাই দিন নিজের সত্য ভাষন অপরের মনে বিরক্ত সৃষ্টি করলে ও তা যে লিপিবদ্ধ করতে পারলাম এই তো স্বার্থকতা।

যাকে পড়ানোর সুবাদে দু'বেলা আহারের বন্দোবস্ত হয়েছিল সেই ষোড়শী তনয়ার নাম "বিষ্টি", দশম শ্রেনীতে পড়ত। একদিন কেমেষ্ট্রি পরীক্ষা নিলাম। পরীক্ষার খাতায় শেষ পৃষ্টায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চম্‌কে উঠলাম । তাতে লেখা ছিল- : এক বন্ধু তাকে আমি ভালবাসি । ইচ্ছা হয় ওর পায়ের কাছে বসে সব খুলে বলি। এতটা কাল যাকে খুঁজেছি তাকে পেয়েছি। মনে হয় তার ভালবাসা না পেলে এ জীবন সম্পূর্ন হবে না। লেখাটুকু বেশ কয়েকবার পড়লাম কিন্তু কোন মন্তব্য করলাম না। এমনিকি তাকে বুঝতে লিাম যে আমি তার লেখাটুকু পড়েছি। দিনে দিনে তার মনের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পড়ালেখায় বেশ অমনোযোগি এবং স্কুল কামাই দিতে আরম্ভ করল। এমনি করে নির্বাচনী পরীক্ষা এসে উপস্থিত হল এবং পরীক্ষাতে উত্তীর্ন হতে পারলনা বলে চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হল। আমি কখনও কাকেও গালি মন্দ করি নাই।রেজাল্ট কার্ড হাতে পেয়ে সইতে পারলাম না। কড়া কড়া দু' একটা কথা বলতেই দেখলাম তার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়ে পড়ছে। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিরুপে তাকে শান্ত করব কোন পথ না পেয়ে অগত্যা পড়ানোর কক্ষ হতে বের হয়ে নিজের ঘরের দিকে যাত্রা করলাম। সেদিন দুপুরে খেতে আসলাম না। ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছি,হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ানোর শব্দে শুনে ত্বড়িৎ গতিতে খুলে দিয়েই দেখলাম বোরখা পরিহিতা একটা মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত দেহের কোন অংশ উম্মুক্ত নাই বলে চিনতে পারলামনা। মেয়েটি কোন কথা না বলে আমার কক্ষে প্রবেশ করল। চারিদিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখলাম কেউ খেয়াল করছে কিনা। যখন দেখলাম কেউ নাই তখন নিজের কক্ষে কম্পিত মন নিয়ে প্রবেশ করে মেয়েটির দিকে না চেয়েই প্রশ্ন করলাম - আপনি কাকে চাচ্ছেন? এবারে তার মুখ হতে নেকাব খুলে পড়ল। তার দিকে চেয়ে চমকে উঠে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম- বিষ্টি...তুমি? আমার দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিছুটা কান্না শেষে ধীরে ধীরে বলল- আমি ইচ্ছাকৃত ফেল করেছি। ইচ্ছাকৃত ফেল করেছ! কিন্তু কেন? আজকের সেই দিনটির জন্য, জানেন স্যার সকালে চোখে যে পানি দেখেছেন তা কষ্টের নয়, আনন্দের। - আনন্দের ! এই প্রথম বুঝতে পারলাম আমার প্রতি আপনার আন্তরিক টান আছে। আর ও আগে এভাবে আমায় শাসন করলেন না কেন? কেন বুঝতে চাইলেন না আমি আপনাকে

ভালোবাসি? – বিষ্টি! – হ্যাঁ স্যার আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনি ছাড়া এজীবন অর্থহীন। – তা কি করে হয়? – কেন হয়না?

তুমি আমার আশ্রয়টুকু কেন কেড়ে নিতে চাচ্ছ? দারিদ্রতা আমার চারপাশে ঘিরে – দারিদ্রতাময় জীবনের ভাঙারথে কোন সারথীকে আশ্রয় দিয়ে আমি আর বোঝা বাড়াতে চাইনা। – তার অর্থ এই দাড়াঁল যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন না। ঠিক আছে আমিও বলে রাখছি আর কোনদিন আপনার সামনে যাবনা এবং পড়ালেখা ও করবনা। আর বসলনা – উঠে চলে গেল। বিষ্টি চলে যাবার পর সারাটা বিকাল আমার বিভিষীকাময় লাগল। বসে বসে ভাবতে লাগলাম এখন কি করা যায়? একদিকে নিজের দায়িত্ব কর্তব্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা অন্যদিকে বিষ্টির পড়ালেখা এখন আমি কি করব? খালা আম্মাকে কি বলে দেব? না থাক তাতে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। আমি ভাল করেই জানতাম বিষ্টি যা বলেছে তা সত্যি। আমি ওকে তিল তিল করে চিনেছি। ঘড়ির কাটার দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে চোখ অস্থির অশান্ত হয়ে উঠছে। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন আবার তার সাথে কথা বলব? প্রতীক্ষার অবসান ঘটল আর আমি যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছলাম। বিষ্টি যা বলেছে তাই ঠিক। আমার কাছে ও আর আসল না, এমনকি পড়তেও বসলনা। ব্যাথায় সমস্ত বুকটা কুঁড়কে উঠল। নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে দু' টো খেয়ে পুনরায় বাসায় পৌঁছলাম। সে রাত্রে হঠাৎ করেই গায়ে প্রচন্ড জ্বর উঠল। ফোন করে বলে দিলাম আমার অসুস্থতার কথা। কাঁথা গায়ে দিয়ে অবচেতনের ন্যায় পড়ে আছি। দরজা খোলাই ছিল। কখন যে বিষ্টি এসে ঘরে প্রবেশ করেছে তার কিছুই বুঝতে পারি নাই। তন্দ্রা কেটে গেল, কপালে কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে। উঠে বসতে যাব তৎক্ষনাত সে বাধা দিয়ে বলে উঠল– অসুস্থ শরীর নিয়ে না উঠলে কি নয়? আপনি শুয়ে থাকেন আমি মাথায় পানি ঢেলে দিচ্ছি। বাস্তবিকই ও তাই করল। ওর হাতের স্পর্শে আমার মনের সমস্ত কুঁড়ি যেন বিকশিত হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে আমি বিষ্টির প্রতি বৃষ্টির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছি। এতদিনে যেন জীবনের মর্ম মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করতে পারছি। মা ব্যাতিথ কোন নারীর এমন সেবা এখনও ঘটে নাই। মনে হচ্ছে এইতো জীবনের আসল সুখ। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? আরও আগে আমায় এ স্পর্শ দিয়ে জাগিয়ে দিলে না কেন? এ স্বর্গীয় সূধা কি আমি উপেক্ষা করতে পারি? ধীরে ধীরে চোখ তুলে তার দিকে চাইলাম। দেখলাম আর চোখে-মুখে তৃপ্তীর এক অপূর্ব ছায়া খেলা করছে। অত্যান্ত দুর্বল স্বরে তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম–

বাতাসের এক মুখ আছে– তাকে ভালোবাসতে হয়। যে মুখ ভালবাসে তোমার মুখ। তোমার কণ্ঠের বিশাল ঝড় আমায় অক্টোপাসের মত আকৃষ্টকরে । যা কিছু আমার জানা–যা কিছু অজানা। আমার প্রেম তোমার প্রেম–তোমার প্রেম আমার। হয়েছে আর কাব্য চর্চা করতে হবে না। এখন একটু ঘুমাও। এই যা তুমি বলে ফেললাম। সম্বোধন কোন ব্যাপার নয়। তোমার মন থেকে তুমি বের হয়েছে, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। আচ্ছা আমি এখন যাই। রাতে খেতে এসো– আম্মু তোমার জন্য চিন্তা করছে। এমনি করে দুটি জীবন নদী একই মোহনায় মিলিত হল। কেউ সম্মুখে থাকলে বিষ্টি আমাকে আপনি সম্বোদন করত আর না থাকলে তুমি। বেশ ভালই লাগত।অন্য প্রেমিক যুগলদের মত বিষ্টির মাঝে আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

নিয়মিত পড়ালেখা করত এবং বিদ্যালয় কামাই করত না। যথারীতি নির্ধারণী পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে এস, এস, সি পাশ করে উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষে ভর্তি হল। আমি তখন অনার্স তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। হঠাৎ একদিন দুটি জীবন নদীর মিলনমুখে বাধার বালুচর জেগে উঠল। চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসে দু'জনই উপস্থিত হলাম। সেদিন ছিল শ'বে বরাতের রাত। আমি পড়াতে গেলাম। শুনলাম সৌদি আরব হতে ফোন এসেছে। বিষ্টির হবু স্বামী ফোন করেছে। ফোন ছেড়ে দিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল– একটা চাকরির ব্যবস্থা কর– মামারা আমার বিয়ে ঠিক করেছে, ছোট-খাট একটা চাকরী হলেই আমরা বিয়ে করব। হাতে সময় একদম কম। অনার্স পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, আমাকে কে চাকরি দেবে? তাহলে আমি কি করব? তুমি বরঞ্চ খালা আম্মাকে খুলে বল, আমাকে কিছুদিন সময় দাও। তা সম্ভব নয় কেউ আমার কথা রাখবে না। আব্বু মারা যাওয়ার পর মামারা সংসারের দেখাশুনা করছে, এমনকি ভাইয়াকে পর্যন্ত বিদেশে নিয়ে গেছে। তাদের ইচ্ছার বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাহলে তুমি কিছুই করবেনা – এইতো?

আমি তা বলিনি তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। পরের দিন থেকে শুরু হল এইচ,এস,সি পাশের সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি খোঁজা। চাকরির বাজারে নেমে বুঝতে পারলাম এতদিনের কষ্টে অর্জিত সার্টিফিকেট আসলে ঠোঙা বানানো কাগজের মত। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের টাকা চাই যার বন্দোবস্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হাজার মাস চেষ্টা করলেও সোনার হরিণের সন্ধান পাবনা। তাই বিষ্টির আশা একেবারেই ছেড়ে দিলাম। যথাসময়ে বিষ্টির হবু বর বাংলাদেশে এসে পৌঁছল। ইতিমধ্যে উক্ত বিয়েতে বিষ্টি ও প্রবল আপত্তি তুলেছে। দশের রায় যেখানে সেখানে একের মতামত অগ্রাহ্য। যখন কোনমতেই বিষ্টি রাজী হল না তখন বলির পাঁটা হলাম আমি, একদিন খালা আম্মা একান্ত সঙ্খোপনে আমাকে ডেকে বললেন। বাবা রবি আজ আমার সামনে এক কঠিন বাধার পাহাড়। ইচ্ছে করলে তুমি এ বাধার পাহাড় ভেঙে দিতে পার। বিষ্টিকে নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও নতুবা এ পথ ছেড়ে দাও। চোখের সামনে ভেসে উঠল অসহায় বাবা মা আর ভাই বোনদের ছবি। ভাবলাম যাদের কারণে পৃথিবীর মুখ দেখেছি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। পালিয়ে গেলে তো আবার ও সেই ঘরে যেখানে দারিদ্রতা আর না পাওয়ার জ্বালা। বিভিষীকাময় এক জীবন। তার চেয়ে বিষ্টি সুখে থাক্। যাকে ভালবাসি তার সুখের মাঝেই আজীবন কাটিয়ে দেব। তাই খালা আম্মার কথার প্রতিউত্তরে বলে উঠলাম– আপনি বিয়ের আয়োজন করুন। আমার কথার প্রতিউত্তর শুনে খালা আম্মা আমাকে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন। বুঝলাম আমার চেয়ে বিদেশী জামাইকে তিনি বেশি পছন্দ করেছেন। আর করবেন না কেন? আমার কি আছে? সর্বোপরি দুটো সার্টিফিকেট। কিন্তু যার সাথে কন্যার বিয়ে হচ্ছে তার সার্টিফিকেট না থাক কিন্তু টাকা তো আছে। বাঁচতে হলে টাকা চাই , অনেক টাকা। শিক্ষক উপলক্ষ মাত্র। আসলে টাকাই সব। যার ঘরে টাকা আছে তার ঘরে কন্যা সুখেই থাকবে। আপন কণ্যার সুখ কে না চাই? ক্ষনকাল পর সমব্যাথার সুরে তিনি বললেন– তুমি বড্ড ভাল ছেলে। কিন্তু আমি কি করব? আমাকে বোঝার চেষ্টা কর। আর শোন বিয়ের সমস্ত কিছু তোমাকেই দেখতে হবে। কোন জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর হতে বের হয়ে গেলাম উদ্দেশ্য শান্তির বাসায় যাব–কিন্তু পথিমধ্যে তার সাথে সাক্ষাত ঘটল

বলে দু' জন একত্রে আমার বাসায় গিয়ে উঠলাম।বাসায় ফিরে ভাবলাম কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকলে বিষ্টি আমাকে ভুলে যাবে। 'চোখের আড়াল, মনের আড়াল' প্রবাদটার স্বার্থক ব্যবহার করতে চাইলাম। বাড়ী ওয়ালার বাড়ী ভাড়া পরিশোধ করে দিয়ে দেখলাম বেশ কিছু টাকা অবশিষ্ট আছে। ভাবলাম এরাত্রেই আমাকে শহর ছাড়তে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রবাদি যা কিছু নেবার প্রয়োজন মনে করলাম সব কিছু নিয়ে অবশিষ্ট গুলি শান্তকে বিক্রি করে টাকাগুলি ডাকযোগে আমার বাড়ীতে পাটিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে ঘর হতে বের হলাম। শান্ত অবশ্য প্রবল আপত্তি তুলে ছিল। তাকে পাত্তা না দিয়ে শান্তনা দিয়ে বললাম কিছুদিন পর আবার ফিরব তখন না হয় আবার কেনা যাবে। শান্তকে ঘরের চাবি দিয়ে ঘর থেকে পথে বের হলাম। বারবার মনের মাঝে বিগত চারটি বছরের স্মৃতি উঁকি মারতে লাগল। পথে কত পরিচিত মুখ চোখে পড়ল। সবাইকে শান্তনা দিয়ে একটি কথাই বললাম যে সপ্তাহকাল পরেই ফিরে আসব। এমনিভাবে সর্বশেষ গাড়ী ধরে রাত্রিকালেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বাড়ির উঠোনে পা দিতেই মনটা ছ্যাঁ করে উঠল।তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দেখলাম বাবার শিয়রে মাটির প্রদীপ মৃদু মৃদু আলো বিকিরন করছে আর মা বাবার শিয়রে বসে তাল পাখার বাতাস করছেন। ছোট দু'ভাই-বোন বাবার শিয়রে বসে আছে।মাকে জিজ্ঞাস করে জানতে পারলাম আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই বাবার পেট ব্যাথা শুরু হয়েছে। ব্যাথার যন্ত্রনায় মাঝে মাঝে তিনি অস্থির হয়ে উঠছেন। ডাক্তার দেখানোর সামর্থ অমার শ্রদ্ধেয় জননীর নাই, তাই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন আমার আশায়। দেরী না করে ত্বড়ীৎ গতিতে মধ্য রাতেই গ্রাম্য ডাক্তার আবুল ভাইকে ডেকে আনলাম। তিনি সবকিছু দেখে ঔষধ দিয়ে গেলেন আর বারংবার শান্তনা দিতে লাগলেন যে তেমন কিছু হয় নাই। কিন্তু ডাক্তারের কথা সত্যি হল না। সকাল নাগাদ বাবার অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারন করল। শেষ অবধি রাউজান স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করানো হলো। সেখানকার কর্তব্যরত ডাক্তার অপারগতা প্রকাশ করে শহরে নিয়ে যেতে বললেন কিন্তু শহরে আর নিতে হল না। বাবা চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। ডাক্তার কে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম ঠিকমত খাবার-দাবার না খেয়ে কঠিন পরিশ্রমের কারণে বাবার অ্যাপ্রেনটিসাইটিস হয়েছিল কিন্তু বাবা সেদিকে গুরুত্ব দেননি তাই আজ এ পরিনতি। বাবাকে ভূ-গর্ভে অত্যান্ত সযত্নে লুকিয়ে রেখে সংসারের হাল ধরলাম। পড়ে রইল অনার্স– পড়ে রইল মাষ্টার্স। ভাবলাম নিজে যা পারি নাই ছোট দু' ভাইকে অন্ততঃ কিছুটা টেনে নিয়ে যাব। শেষ অবধি সফল হলাম। নিজের কঠোর সাধনা আর তত্ত্বাবধানে ছোট ভাই দুটিকে সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে সক্ষম হয়েছি। ওরা টিউশানি করে এখন পড়ালেখা ব্যাস্ত। ছোট বোনটাকে সহি-সালামতে অপরের ঘরে পাঠাতে সক্ষম হয়েছি। জানিনা তাদের ভবিষ্যৎ কোনদিকে মোড় নেবে। মাকে একেলা বাড়ীতে রেখে কাজের সন্ধানে শহরে এসেছি, অবশ্য ভালই আছে। অনেকবার মা নিজের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য ছেলের বউ আনতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি কারণ বিষ্টি আজ ও হৃদয় মাটিতে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে। কতক্ষন তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম জানিনা। ঘড়িটা থাকলে হয়তো বোঝা যেত। কিন্তু সেটিও ওরা নিয়ে গেছে। আর সময় জানার প্রয়োজনই বা কি? যার কিছু হারাবার ভয় নেই তার দিনই বা কি আর রাতই বা কি? উঠে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম।

সী-বীচ হতে বের হবার পর বুঝতে পারলাম রাত অনেক হয়ে গেছে। রাস্থায় কোন গাড়ী নেই। শুধু দু' একটা রিক্সা চলছে। রিক্সা ভাড়া দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার সামর্থ নেই। সারাটিজীবন কাউকে ঠকায় নাই কাজের খোজে গ্রাম্য প্রতিবেশীর ভাড়াবাসায় এসে উঠেছি এই রাত্রিকালে তাকে জাগিয়ে রিক্সাভাড়া পরিশোধ করে দেওয়া উচিত হবে না ভেবে বিধাতার দেওয়া পা দুটিকে ব্যাবহার করে দ্রুত হাটতে লাগলাম। সী বীচ হতে পোর্টকানেকটিং রাস্তাটা কম নয়। তবুও তো কোন উপায় নাই হাঁটতে হাঁটতে ভবিষ্যৎ কল্পনায় আবার ও নিমগ্ন হলাম। নিজেই নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম রনি-রকি যদি এদের মত হয়? পরক্ষনে নিজেই নিজের মনের সাথে বিদ্রোহ করে বলে উঠল–হলে আমি কি করব? এই দেশতো এখন ছিনতাই কারীদের দখলে। শ্রমিকের ঘাম ঝরা পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ লুন্ঠনকরে ক্ষমতাবানরা প্রাসাদের মালিক হয়। শিক্ষা নামক পবিত্র অংগনকে ওরা দুইভাগে বিভক্ত করেছে। ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে চলে সার্টিফিকেট কেনা বেচা। যে সার্টিফিকেট টাকার বিনিময়ে কিনে নেয় সেই সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরী ও কিনে নেয়। আর যারা কৃষক শ্রেনীর দরিদ্র গ্রেজুয়েট তারা হতাশার অন্ধকারের অতল অতন্দ্রে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। হায় সভ্যতার কর্ণধাররা একটিবার গ্রামে ফিরে গিয়ে দেখ রোদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে যে কড়ি তারা আয় করে তার সিংহভাগই তুলে দেয় তাদের সন্তানদের হাতে। সন্তানরা একদিন মানুষ হবে কিন্তু তা আর হয় না। শেষে ক্লান্ত অবিভাবক গণ সন্তানদের আকুতি জানাই " ফিরে আয় বাবা, আমি আর পারিনা" ।কিন্তু সন্তানরা আর ফিরে যেতে পারে না লজ্জায় ঘৃনায়। তাদের উপর অপবাদ আসবে নকল করে পাশ করার। শেষে চাকরির নামে অবিভাবকদের শান্তনা দিয়ে বেছে নেয় ছিনতাইয়ের পথ আর হতাশার জ্বালাকে নিবারণ করতে মাদকাসক্তিতে আসক্তি হয়ে পড়ে।

আমার একথা শুনে ও এটাকে হয়তো বলবেন " The main way of education is not to employment but mental satisfaction" তাদের আমি শুধু এটুকু বলব যে পেটের ভিতরের ক্ষুধার্ত বিষাক্ত কাল সাপটা যদি মানসিক সন্তুষ্টি মানত তবে সর্বাগ্রে আমিই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান আহরণ করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সে তা মানেনা। আবার এও প্রশ্ন জাগতে পারে যে ইচ্ছা করলে তো তারা পরিশ্রম করে আয়-রোজগার করতে পারত। একথা ঠিক কিন্তু তাই যদি করবে তবে এতটাকাল এতটা কষ্ট করে সার্টিফিকেট অর্জন করে অন্যায় পথ অবলম্বন করে একজন হবে মনিব আর সততার পথ অবলম্বন করে আর একজন হবে চাকর। হায় শিক্ষা! ধিক্ তোমায়।

ছি ছি এসব আমি কি ভাবছি? যার কোন সমাধান হয়নি বা হবে ও না তাই যার যেখানে খুশী মরুক–আমার কি? যতটুকু কর্তব্য ছিল পালন করেছি এখন যার যার পথ খুঁজে নিক। ওরা দুইজন যদি ছিনতাইকারী হয় আমি বাধা দেব কি ভাবে? আমি নিজেও তো একই শিকারীর শিকার। থাক্ থাক্ আর বলে কাজ নাই। যার প্রতিকার করার ক্ষমতা নাই তার মুখে বড় বড় কথা মানায়না। অতএব পথ ধরে হাঁটছি হেঁটেই যাই। অনেক্ষন হেঁটে রাস্তার মাথায় এসে

উপস্থিত হলাম। প্রতিবেশীর বাসা এখনও বেশ খানিকটা ঘুরে গলির শেষ মাথায় ইতিমধ্যে আকাশ ভেঙে শ্রাবনের বারিধারা আরম্ভ হল। কোন উপায়ন্তর না দেখে রাস্তার পাশের একটা বাড়ীতে প্রবেশ করলাম।

বাদলধারা থামল না। এদিক-ওদিক চেয়ে শেষে দেখতে পেলাম সিঁড়ির পাশে একটা বেঞ্চি পাতা আছে তারই ওপর সটান শুয়ে পড়লাম। পেটের ক্ষুধা আর দীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার কিছুই জানিনা। সকাল বেলা ঘুম ভাঙল পাঁচ-ছয় বছরের ফুটফুটে একটি ছেলের ডাকা-ডাকিতে। ছেলেটি ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে বলে বসল তার আম্মু আমাকে ডেকেছেন। শত চেষ্টা করেও তার হাত হতে নিস্কৃতি পেলাম না। অগত্যা ভেতরে ডুকতে হল।

ভেতরে নিয়ে গিয়ে ছেলেটি ড্রয়ংরুমে বসাল। ঘরটি খুবই সুন্দর। সাজানো-গোছানো। দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে আমার পছন্দনীয় ব্যাক্তিদের ফটোগ্রাফ। তন্ময় হয়ে দেখছিলাম হঠাৎ একটি লুঙ্গি আর তোয়ালে নিয়ে পুনরায় ছেলেটি এসে আমাকে বলে বসল– আম্মু তোমাকে গোসল করতে বলেছেন আর দুপুরে ভাত না খেয়ে যেতে দেবন না। সে কি কথা! আমার তো কাজ আছে। থাক্ কাজ কালকে করবে। তুমি চলে গেলে আম্মু আমাকে বকবেন। কি আর করা অগত্যা বাথ রুমে ডুকতে হল। গোসল করার সময় ছেলেটির মুখচ্ছবি ভেসে উঠতে লাগল আর ভাবতে লাগলাম– ইস্ ! এমনি যদি আমার একটা ছেলে থাকত। ঠিক এমনি করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এগিয়ে দিত আর গলা ধরে আদর করে কচি মুখের চুমায় আমার এ মুখটা ভরে দিত। থাক্‌গে সেসব–ওর বাবা মাকে এখনও পর্যন্ত দেখলাম না।বড় ইচ্ছে জাগাই এমন সন্তানের মা বাবা কে দেখার।

গোসল সেরে নাস্তা করে দুইজনে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে কাটালাম। ইতিমধ্যে দুপুর হয়ে গেছে। খাবারের বন্দোবস্ত ও ড্রইংরুমেই হল। কাজের মেয়ে সবকিছু সাজিয়ে দিয়ে গেল। আহারান্তে পুনরায় ভেতর হতে খবর আসল যে বিকেলের আগে আমার ছুটি হবে না। ড্রইংরুমেই বিছানা পাতা ছিল। প্রতিদিনের অভ্যাস মত ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ছেলেটিও আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। আবারও সেই গল্পের বায়না। ঘুম ঘুম চোখে কিছুটা গল্প শোনাবার পরই ও ঘুমিয়ে পড়ল। আমার চোখে নিদ্রাদেবী তখন ও আসন পেতে বসেনি– বসবে এমনই অবস্থা। আবার ও সেই কল্পনা। কল্পনা করতে লাগলাম এরা আমার কে? এত আদর যত্নই বা কিসের জন্য? আট-নয় বছর আগে শহরে ছিলাম কিন্তু এখানে তো কেউ আমায় পরিচিত ছিলনা। আবার কেউ থাকবে এমন সম্বাবনা ও ক্ষীন। তবে কি স্বপ্নের মায়াজগতে বাস করছি? তাই বা কেন, কাল বিকাল অবধি সমস্ত ঘটনাইতো স্পষ্ট মনে পড়ছে। এমনি ঘুম আর জাগরণের মাঝে অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম ঠিক সেই মুহুর্তে কখন যে একটি নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে তার কিছুই বুঝতে পারি নাই আর প্রবেশ করে বসে থাকলে না হয় হত কিছু একেবারে আমার পায়ের ওপর তার মাথা রেখে দু' চোখের অশ্রু ছেড়ে দিয়েছে। বহমান অশ্রু রাশি আমার দুই পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে যখন তন্দ্রা কেটে গেল

চমকে উঠে পা হতে তার মাথা তুলিবামাত্র আরও অধিক চমকে উঠলাম। অস্বফুট স্বরে মুখ হতে উচ্চারিত হল – বিষ্টি!

বিষ্টি মুখ তুলে আমার মুখপানে চাইল। অশ্রুরাশি তার মুখে অজস্র নালার সৃষ্টি করেছে। কয়েকফোটা অবশ্য আঁখির পাতায় টলমল করছে। মুছে দিতে বড় সাধ জাগল। আবার মনে হল না থাক্ - অপরের বাগদত্ত স্ত্রীকে স্পর্শ করা উচিত হবে না তাই প্রসারিত হাতটি পুনরায় সংকুচিত হয়ে গেল। যে অধিকার ছেড়ে দিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।বেশ কয়েকমিনিট এভাবে নিরবতার মাঝে কাটল, তারপর নিরবতা ভেঙে বিষ্টি কথা বলে উঠল– ভেবেছিলাম এজীবনে আর তোমার স্বাক্ষাত পাবনা– কিন্তু কপাল গুনে আবারও দেখা হয়ে গেল। কি অপূর্ব নিয়তি আমার! বিষ্টির মুখে নিঃসৃত শেষ বাক্য শুনে আবার ও চমকে উঠলাম। উঠে তার মুখের দিকে চাইলাম। চেয়ে অনেকপূর্বে দেখা বিষ্টিকে আবিষ্কার করতে পারলাম না। একি সেই কৈশোর বয়সের সেই বিষ্টি! সত্যি জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হয়, কৈশোর যৌবন–বার্ধক্য তারপর অনন্তলোকে যাত্রা। নিজের একান্ত স্থায়ী বলে জগতে কিছু নাই। সবই পর, মায়া–মরীচিকা। তবু ও মানুষ সমস্ত কিছু নিজের বলে দাবি করে। আমিও তো বিষ্টিকে একান্ত আপনার বলে দাবি করতাম কিন্তু সেতো আমার হলনা। সেই কৈশোরের বিষ্টি ক্ষনকাল আমার মনে আশা সঞ্চার করেছিল আর এই বিষ্টি অপরের আশা পূর্ণ করে এখন পরিপূর্ণ গৃহিনী। যে স্নেহসূধা একদা সে আমায় দিত এখন তা অন্যের ওপর বর্ষিত হয়। এইত আমার পাশে শায়িত তার সন্তান। নিজের অজান্তেই চোখ দুটি সন্তানের পানে ফিরে গেল। মায়াবী নিদ্রায় মগ্ন শান্ত শিশুটি অনেকটা দেখতে তার মায়ের মতোই। স্নেহ–মমতা ও ঠিক তেমনি। কি সুন্দরভাবে সারাটিদিন আমার সাথে হেসে খেলে বেড়াল। ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম আবার ও বিষ্টির প্রশ্নবানে তলদেশ হতে ভেসে উঠলাম। কি ভাবছ? বিষ্টির প্রশ্নবানে বিদ্ধ হয়ে ঈষৎ হেসে উঠলাম তারপর অত্যান্ত আগ্রহ নিয়ে বললাম– যেটা জানা প্রথমেই প্রয়োজন ছিল –জানতে চাইনি বলে ক্ষমাপ্রার্থনা। কি জানতে চাও? তোমার স্বামী কোথায়? আমার কথা শুনে এক মায়াবী হাসি হেসে বিষ্টি বলে উঠল– তুমি এখনও ছেলে মানুষই রইলে, তোমার কি মনে আছে প্রথম যেদিন আমাকে পড়াতে এসেছিলে সেদিনের কথা? তোমার সহজ–সরল আর হাবা–গোবা চেহারা দেখে কত যে হেসেছিলাম...। এই বুঝি আমার প্রশ্নের উত্তর? জানা কি খুবই প্রয়োজন? অবশ্যই। গত বছর বিদেশ হতে এসে বাড়ীটা করে আবার চলে গেছে। আচ্ছা বিষ্টি একটা প্রশ্ন করব? কর। আমার উপর খুব রাগ করেছিলে না? প্রথম প্রথম –তারপর শান্ত ভাইয়ার কাছে সব মুনে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম–কিন্তু তোমার কথা ভেবে পারি নাই। কেন? কারণ আমি বিশ্বাস করতাম তুমি একদিন আসবে। প্রতীক্ষা করতে। প্রতীক্ষা করেই তো ছিলাম– এইত আজ পেলাম। পন্যের মত হাত বদল হলে ক্ষতি কি? নির্বাসন। নির্বাসন নয়তো কি? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে সংসার করতে হচ্ছে–এযে কি দুঃসহ যন্ত্রনা তা তুমি বুঝবেনা রবি। বিষ্টির কথা শুনে আমার মন ভেতরে ভেতরে হেসে উঠল কিন্তু মুখ হাসল না। এই প্রথম একটা অপবাদ আমার উপর পড়ল আর তা হলো আমি তার কষ্ট বুঝি না। তাকে বলতে চাইলাম দুঃখ সয়ে সয়ে দুঃখকে সুখ বলে মনে হয়। মনিষীরা বলেছেন দুঃখ

জিনিষটা অভাব ও নয় শুন্য ও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ তা সুখের মতই উপভোগ করা যায়। যেদিন তোমাকে হারিয়েছি সেদিন হতে আর হারাবার ভয় নাই – তাই দুঃখও নাই। কিন্তু বলতে পারলাম না। তাই তার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর মুখ খুলে বললাম।তোমার সন্তান? তুমি ওর বাবা হলে আর নাই বা হলে ও ওর বাবার সাথে থাকবে। তা কি করে হয়–তা হয়না। ও ভালো করেই জানে আমি ওর বাবা নই। আর ওকে ফেলে রেখে গেলে মা হীন এই এতিম বালক নষ্ট হয়ে যাবে। আমাকে বাবা হিসাবে ও না পারবে মেনে নিতে আর না পারবে তোমাকে ছাড়া থাকতে। ও দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যাবে তোমার আমার কিছুই করার থাকবেনা। তাছাড়া সারাটাজীবন ও তোমাকে ভুল বুঝবে– সন্তানের চোখে মায়ের খারাপ মূর্তি নিষ্টুর নয়কি?

তাহলে কি কোনদিন ও তোমাকে পাব না? কেন পাবে না? এইত আমরা আছি কত কাছাকাছি–নাই বা ছুঁইলাম, ফুল স্পর্শ না করে কি গন্ধ পাওয়া যায় না? আমি তুমি কেউ তো নাস্তিকনই ধর্মমত সৃষ্টিকালীন সময়ে স্রষ্টা তোমার স্বামীর শরীর থেকেই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকেই মেনে নাও। তাছাড়া এতটা কাল পর .....। তবে কি তোমার জন্য কেউ সৃষ্টি হয়নি? বিয়ে করলেনা কেন? কে বলেছে হয়নি? দারিদ্রতা আমার স্ত্রী আর তা থেকে যে কষ্ট বের হয় তারাই আমার সন্তান।– রবি! হ্যাঁ বিষ্টি এইত তুমি দুঃখ করিনা আর কয়টা দিন তারপর চিরপরিচিত সমস্ত স্বজনকে ছেড়ে চলে যাব অনন্তলোকে। এই কয়টা দিন কে দেখবে তোমাকে? এইত তুমি আছ– আমার দু' সন্তান আছে ভার্সিটিতে পড়ে। ওরাই একদিন আমাকে দেখবে– আর ওরা না দেখলে তুমি কি দেখবেনা? তুমি সত্যি থাকবে আমার পাশে? হয়তো.....। তারপর সবিস্তারে শহরে আসার কুশল জিজ্ঞাসা করে তার বাড়ীতে অবস্থান করার প্রস্তাব দিয়ে বসল। কিন্তু প্রত্যাখান করে বিষ্টির বাড়ী ত্যাগ করলাম। অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিলাম প্রয়োজন পড়লে তার বাড়ীতেই উপস্থিত হব এবং সেখানেই থাকব। কিন্তু আমি জানতাম আর তা কখনোই সম্ভবপর নয়। একটা ফুল দিয়ে দুইটা দেবতার পূজা হয়না, আর যদি তা করা যায় ফুলের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। আমি পথিক–পথকে অবলম্বন করেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। ঘর হতে বের হয়ে যখন রাস্তায় নামলাম তখন মুখ হতে নিঃসৃত ফিলিপেপার লেখা সেই কবিতা।

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, নাটোর, বাংলাদেশ, ২১/০২/২০০৬